সম্পাদকীয়

অকৃজ্ঞতার এই ইতিহাস আর কত প্রলম্বিত হবে!

অপরাধী যখন প্রশ্রয় পায় আরও বড় অপরাধের প্রতি দুঃসাহসী হয়ে ওঠে। কোনো ফেরাউন একদিনে তৈরী হয় নি। প্রতিটি অপরাধের পর প্রাপ্ত প্রশ্রয় তাকে ধীরে ধীরে 'আমিই সর্বোত্তম খোদা' বলবার পথে অগ্রসর করে দিয়েছে। তুমুল নিপীড়নের পরও যখন প্রতিবাদ রুখে দাঁড়ায়নি তার বিরুদ্ধে, নিজেকে সে ভাবতে শুরু করেছে সর্বশক্তিমান। টাওয়ার নির্মাণ করে যুদ্ধে নামতে চেয়েছে স্বয়ং স্রষ্টার বিরুদ্ধে। নিজেকে ভেবেছে জীবন ও মৃত্যু মুঠোয় পুরে রাখা অহঙ্কারী নমরুদ। বস্তুত, নমরুদ ও ফেরাউনদের জন্মের পেছনে খানিকটা দায় মাজলুম জনতারও রয়েছে। আবহমান বিচারহীনতা ও রাষ্ট্রীয়ভাবে শরিয়াহ আইন প্রতিষ্ঠায় উন্নাসিকতা প্রতিনিয়ত আমাদের সামাজিক শান্তি ও নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করছে।

৫ মে ২০১৩। স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশের ভয়াবহতম কালরাত। প্রিয় নবিজির ভালবাসার দায় নিয়ে, নাস্তিক ও দেশদ্রোহী ব্লগারদের শাস্তির দাবি নিয়ে লক্ষ জনতা জড়ো হয়েছিল রাজধানীর শাপলা চত্বরে। তৎকালীন নিপীড়ক স্বেচ্ছাচারী সরকার রাতের আঁধারে নবিপ্রেমী নিরস্ত্র মানুষগুলোর ওপর লেলিয়ে দিয়েছিল র‍্যাব, বিজিবিসহ তার পেটুয়া বাহিনী। মিডিয়া ব্ল্যাকআউট করে চালিয়েছিল স্মরণকালের নৃশংসতম গণহত্যা। কতগুলো তাজা প্রাণ ওরা কেড়ে নিয়েছিল সেরাতে, বিগত এক যুগেও তার হদিস উদ্ধার সম্ভব হয়নি। তবে, পুলিশের সদর দফতরে প্রদত্ত রিপোর্ট থেকে জানা যায়, রাত ২টা ৩১ মিনিট থেকে ৩টা ১১ মিনিটের মধ্যে, মাত্র ৪০ মিনিটের এই অপারেশনে অংশগ্রহণ করেছিল পুলিশ, র‍্যাব ও বিজিবির ৭৮৮৫ (সাত হাজার আটশ পঁচাশি) জন সশস্ত্র সেনা। ৮০,০০০ (আশি হাজার) টিয়ার শেল, ৬০,০০০ (ষাট হাজার) রাবার বুলেট, ১৫,০০০ (পনের হাজার) শটগানের গুলি ও ৩০০ (তিনশ) রিভালবারের গুলিসহ মোট ১,৬৭,৩০০ (এক লাখ সাতষট্টি হাজার তিনশ) গোলাবারুদ ব্যবহৃত হয়েছিল সম্পূর্ণ নিরস্ত্র নিরীহ ধার্মিক মানুষগুলোর ওপর; যার অর্ধেক তথা ৫৫,৭৬৬ (পঞ্চান্ন হাজার সাতশ ছিষট্টি) রাউন্ড গোলাবারুদ খরচ হয় ৪০ মিনিটের 'অপারেশন সিকিউরড শাপলা'য়। জঘন্যতম এই হত্যাযজ্ঞের পর সরকারদলীয় প্রধান শেখ হাসিনা থেকে শুরু করে দলটির সর্বস্তরের নেতাকর্মীরা নেমে পড়েছিল ব্যঙ্গবিদ্রুপ আর নিপীড়নের স্টিমরোলার নিয়ে। পথে পথে বেধড়ক পেটানো হয়েছিল মাদরাসার কোমলমতি শিশু-কিশোরদের। দলবল নিয়ে ভাঙচুর করা হয়েছিল বিভিন্ন মাদরাসা। জোর খাটিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল অরাজনৈতিক ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো। হেফাজতের সমাবেশে অংশগ্রহণের অপরাধে চাকরিচ্যুত করা হয়েছিল অসংখ্য ইমাম ও মাদরাসা শিক্ষককে। এরপর নির্লজ্জতার চূড়ান্ত করে সংসদে দাঁড়িয়ে শেখ হাসিনা বলেছিল, 'কোনো গোলাগুলি হয়নি সেরাতে; মাদরাসার ছেলেপেলে গায়ে লাল রঙ মেখে শুয়েছিল।' সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত কটাক্ষ করে বলেছিল, 'হেফাজকর্মীরা মার খেয়ে সুবহানাল্লাহ বলে দৌড়ে পালিয়েছে।' পরিস্থিতির ভয়াবহতায় শহিদ সন্তানের রক্তমাখা দেহ রাতের আঁধারে দাফন করে দিয়ে মুখবুজে কাঁদতে হয়েছে বেদনাদগ্ধ মায়ের; কান্নার আওয়াজ শোনা গেলেও সপরিবারে হত্যার হুমকি দিয়েছিল আওয়ামি ক্যাডাররা। ক্ষোভ ও হতাশায় স্তব্ধ হয়ে যাওয়া মুখ আর কখনো খোলেননি তারা। ফলে, আজও অজ্ঞাতে রয়ে গেছে সহস্র শহিদের গল্প।

এর মাত্র সাড়ে পাঁচ বছর পর, ২০১৮ সালের ৪ নভেম্বর সোহরাওয়ার্দি উদ্যানে কওমি সনদের স্বীকৃতি প্রদানের শোকরানা মাহফিলে লক্ষ লক্ষ জনতার সামনে সরকারের জনৈক আমলা দাবি করে বসে, 'সেদিন কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।' লক্ষ জনতা তীব্র ক্ষোভ নিয়ে তাকিয়েছিল স্টেজের দিকে। একটিমাত্র প্রতিবাদের আশায়। হয়নি। কেউ

প্রতিবাদ করে বলেনি, আপনি মিথ্যা বলছেন। উল্টো দেশের শীর্ষস্থানীয় এক মাদরাসার পরিচালক শেখ হাসিনাকে ‘কওমি জননী’ বলে ঘোষণা দিয়েছিল। বেশ কয়েকজন বক্তা, যাদের সবাই ছিলেন আলেম, মেতে উঠেছিলেন সরকার ও শেখ হাসিনার বন্দনায়। নিকৃষ্টতম গণহত্যার পরও ‘সনদের মূলা’ দিয়ে যখন এমনতর স্তাবকতা প্রাপ্তি হলো, প্রশ্রয় পেয়ে গেলো খুনি। ফলে ২০১৭, ২০১৯, ২০২১ সালে সে আবারও মেতে উঠলো খুনের উন্মাদনায়; ভয়, শঙ্কা, লজ্জা ও সংকোচ জলাঞ্জলি দিয়ে। এবার মূলা দেখানোর গরজও বোধ করেনি সে। নিজেকে ভাবতে শুরু করেছিল ফেরাউন। সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।

সরলপ্রাণ হুজুরশ্রেনীকে মারতে মারতে বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল হাসিনা। ফলে চব্বিশের জুলাইয়ে ছাত্রজনতার দাবি ও আন্দোলনকে নিয়ন্ত্রণের জন্য চেনা পথ বেছে নিয়েছিল সে। নির্বিকারচিত্তে হত্যাযজ্ঞ চালাতে শুরু করেছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ-যুবাদের ওপর। এতদিনের হত্যাযজ্ঞ না-মানুষ হুজুরশ্রেনীর ওপর হওয়ায় গা করেনি শিক্ষিত ‘সুশীলসমাজ’। ১৭ বছর যাবত তাদের নিরবতা ও প্রশ্রয় পেয়ে ফেরাউন হয়ে ওঠা সরকার যখন চড়াও হলো তাদেরই সন্তানদের ওপর, ঘুম ভাঙলো। জেগে উঠলো পুরো দেশ। একযোগে নেমে এলো রাজপথে। প্রতিবাদের প্রাচীর গড়ে তুললো ফ্যাসিবাদি সরকার ও সরকারি বাহিনীর বিরুদ্ধে। সহস্রাধিক তাজা প্রাণ ঝরে পড়লো হাসিনা-বাহিনীর গুলিতে। ১৩৩টি নিরপরাধ শিশুপ্রাণ শহিদ হলো। কোথায় ছিল তখন হুজুরশ্রেনী? ফ্যাসিস্ট সরকারের সুবিধাভোগী বামপন্থী সেক্যুলারদের দুএকজনকে এমন প্রশ্নও করতে দেখা গেছে তখন। সত্যকে ছাইচাপা দেওয়ার দক্ষতা আছে তাদের। বস্তুত, জুলাই আন্দোলনের ভয়ঙ্করতম স্থান, যাত্রাবাড়ী এলাকায় সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছে মাদরাসার তালিবুল ইলমরা। দেশের এই ক্রান্তিলগ্নে ঘরে বসে থাকা অসম্ভব ছিল তাদের জন্য। সম্মুখ সমরে নেমে এসেছিল তারা শহিদি তামান্না নিয়ে, নির্ভীক চিত্তে। গণমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী আশি-উর্ধ্ব আলেম শহিদ হন জুলাই অভ্যুত্থানে। তন্মধ্যে বিশোর্ধ্ব ছিলেন কুরআন কারিমের হাফেজ। নিয়মিত এই আত্মত্যাগের ন্যুনতম প্রতিদান কি রাষ্ট্র তাদের দিতে পেরেছে? বিবেকহীন এই রাষ্ট্র তো তাদের শিক্ষার যথাযথ স্বীকৃতি দিয়ে উঠতে পারেনি আজও। ছাপ্পান্ন বছরেও পারেনি বিশাল এই শিক্ষিতসমাজকে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ জায়গাতে কাজের সুযোগ দেওয়ার ন্যুনতম সৎসাহস দেখাতে। অকৃজ্ঞতা ও বিবেকহীনতার এই ইতিহাস আর কত প্রলম্বিত হবে, আমরা জানি না। আগামীর তরুণ প্রজন্মের কাছে আমাদের বিনীত প্রশ্নটা রইল।